স্মরণে ও মননে প্রয়াত অমলেশ ত্রিপাঠী** ও প্রয়াত অশীন দাশগুপ্ত†

প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায়*

বাংলার ইতিহাসানুরাগী জনগণের কাছ জুন মাসটি (১৯৯৮) 'কালো জুন' নামে পরিচিত থাকবে। প্রেসিডেন্সি কলেজের ইতিহাস বিভাগের ইতিহাসেও ১৯৯৮-এর জুন মাস গভীর বেদনার ও বিষাদের। কুরুভিলা জ্যাকারিয়ার সময় থেকে প্রেসিডেন্সি কলেজের ইতিহাস বিভাগে পঠন-পাঠনে যে নবতরঙ্গ সৃষ্টি হয়েছিল সেই দীর্ঘ ঐতিহ্যের দুই খ্যাতনামা উত্তর-সাধকের জীবনাবসান ঘটল মাত্র এক পক্ষকালের মধ্যে। ১৯৩২ সালে ৪ঠা জুন প্রভাতে ঐতিহাসিক অশীন দাশগুপ্ত এবং ১৯২১-৯৮ সালে ১৮ জুন রাত্রিতে অমলেশ ত্রিপাঠীর দেহাবসান ঘটে। যদিও প্রেসিডেন্সি কলেজে অমলেশ ত্রিপাঠীর উত্তরসূরী ছিলেন অশীন দাশগুপ্ত, কিন্তু অশীন দাশগুপ্ত প্রয়াত হলেন অগ্রজের আগেই।

১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রেসিডেন্সি কলেজে ইতিহাসে অনার্স ও এম. এ পড়ার সুবাদে দুজনের সঙ্গেই যোগসূত্র স্থাপনের সুযোগ পেয়েছিলাম। ইতিহাস যুগের প্রতিবিম্ব আর ঐতিহাসিক তাঁর সময়ের প্রতিনিধি। অমলেশ ত্রিপাঠী ও অশীন দাশগুপ্ত সম্বন্ধে এই মন্তব্য অক্ষরে অক্ষরে সত্য। অমলেশ ত্রিপাঠী প্রাক্-স্বাধীনতা ও স্বাধীনতোত্তর দুই যুগের জীবন্ত সাক্ষী ছিলেন। স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম প্রধান স্নায়ুকেন্দ্র বাংলার হলদিঘাট তমলুক মহকুমার সুতাহাটা থানার দেভোগ (বর্তমানে হলদিয়া) জমিদার পরিবারের সন্তান অমলেশ ত্রিপাঠীর আচারে-আচরণে, বাচনে, জীবনচর্যায় আভিজাত্যের প্রলেপ পড়েছিল। স্বাধীনতা সংগ্রামের ঝড় তাঁকে যেমন উদ্বেল করেছিল, অন্যদিকে তার ঝাপটায় তিনি ভীত সন্ত্রস্ত হয়েছিলেন। ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সময় তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকারের জমিদার-বিরোধী রোষানলে পড়েন। দুই সপ্তাহ ধরে বিদ্যুত বাহিনীর কর্মীরা তাঁকে বন্দী করে রেখেছিল। প্রচুর অংকের মুক্তিপণের বিনিময়ে অমলেশ ত্রিপাঠী মুক্তি পান। অবশ্য অরুণা আসফ আলি হস্তক্ষেপ না করলে তাঁর জীবন নাশ ঘটতে পারতো। এই রোমঞ্চকর অভিজ্ঞতা অমলেশ ত্রিপাঠী সারা জীবন ভুলতে পারেন নি। একথা সত্য, তিনি ভারতের জাতীয় সংগ্রামের অনবদ্য ইতিহাস গ্রন্থ রচনা করেছেন, কিন্তু ভারত-ছাড়ো আন্দোলন সম্পর্কে তিনি কোন উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন নি। গান্ধীজির কাছেও তিনি ব্যক্তিগত ভাবে নালিশ জানিয়েছিলেন।

তমলুকের হ্যামিলটন স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম স্থান অর্জন করে অমলেশ ত্রিপাঠী পড়তে এলেন প্রেসিডেন্সি কলেজে। বাংলার নবজাগরণের অন্যতম প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়তে এসে সেই ঐতিহ্যে অবগাহন করলেন। কৃতী ছাত্ররূপে বিশ্ববিদ্যালয়ের সব কটি স্তরে সাফল্য অর্জন করেন। অর্থনীতি, ইতিহাস আর সাহিত্য—সব ক্ষেত্রে সমান পারদর্শী ছিলেন। ছাত্রজীবন শেষ করে সরকারি কলেজে অধ্যাপনা শুরু করলেন। এর মধ্যে ইংলণ্ড ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গবেষণার কাজ সম্পন্ন করলেন। এরপর ১৯৫৪ থেকে ১৯৬৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত দেড় দশক প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যায়নায় নিরত থাকেন। এই সময়েই ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের ইতিহাস কংগ্রেসের আধুনিক ভারত শাখার সভাপতিত্ব করেন। ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজের ইতিহাস বিভাগের প্রধান অধ্যাপক পদে আসীন হন।

১৯৬০ সালে ত্রি-বার্ষিক সাম্মানিক পাঠক্রম প্রবর্তিত হয়। প্রথম বছরে ১৯৬০ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজে ইতিহাস অনার্স নিয়ে পড়াশুনা শুরু করলাম। বিভাগীয় প্রধান ডঃ ত্রিপাঠী সম্পর্কে ছাত্র-ছাত্রী মহলে যুগপৎ শ্রদ্ধা ও শঙ্কা এই দুই বিপরীত ধারণা সহগত হয়েছিল। আমাদের সময় থেকে অনার্সে আটটি পত্রে পঠন-পাঠন শুরু হয়। পার্ট-ওয়ানে তিনি পড়াতেন আধুনিক ইওরোপের ইতিহাস। ১৭৪০ থেকে শুরু করে ফরাসী বিপ্লব পর্যন্ত ইতিহাস তাঁর কাছে পড়েছি। র‍্যাঙ্কে, ফিসার, অ্যাকটন, লেফেভর, এসব ঐতিহাসিকদের বক্তব্য তিনি তুলে ধরতেন। ঘটনার বিশ্লেষণের চেয়ে বিষয়বস্তুর অনুসন্ধানে তাঁর বেশী আগ্রহ ছিল। অর্থাৎ ইতিহাস পঠন-পাঠন নিছক নীরস ঘটনা পরম্পরার বিবরণ নয়, এর মধ্যে যুগধর্ম ও যুগের স্পন্দন চয়ন করা প্রয়োজন। ইতিহাস যে সময়ের কাব্য (Poetry of time) তা ডঃ ত্রিপাঠীর কাছ থেকে আত্মস্থ করেছিলাম। পার্ট টু-তে ডঃ ত্রিপাঠী পড়াতেন আধুনিক ভারতের ইতিহাস। ১৭০৭ থেকে শুরু করে জাতীয় আন্দোলন পর্যন্ত সমস্ত পত্রটি তিনি একাই পড়িয়েছিলেন। মুঘল সাম্রাজ্যের পতন—ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের উত্থান ও প্রসার, ভারতবাসীর প্রতিক্রিয়া সব দিকগুলিই আলোচনা

** প্রাক্তন ছাত্র ১৯৩৬-৪০ (ইতিহাস)

† প্রাক্তন ছাত্র ১৯৪৮-৫৪ (ইতিহাস)

* প্রাক্তন ছাত্র ১৯৬০-৬৫ (ইতিহাস)

Courtesy: Presidency Alumni Association Calcutta, Kolkata 700073

করেছেন। তবে ১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহ ও সংগ্রামী জাতীয়তাবাদ পড়ানার স্মৃতি এখনও ভাস্বর আছে। প্রসঙ্গত এই সময়েই তিনি ভারতীয় জাতীয় সংগ্রাম বিশেষত চরমপন্থী পর্ব নিয়ে চর্চা শুরু করেছিলেন। আর ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের মহাবিদ্রোহ নিয়ে তিনি 'ইতিহাস' পত্রিকায় অনবদ্য ভঙ্গীতে একটি নিবন্ধ লিখেছিলেন; এখনও তাঁর কোন গ্রন্থে এই নিবন্ধটি সংকলিত হয় নি। এম.এ. পড়ার সময় তাঁর কাছে আধুনিক ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের দিকটি পড়েছিলাম। মনে পড়ে Bengal Past and Present পত্রিকায় চরমপন্থী জাতীয়তাবাদ নিয়ে তাঁর কয়েকটি প্রবন্ধ বেরিয়েছিল যেগুলির ভিত্তিতেই তাঁর The Exteremist Challenge গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়।

১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর এম. এ. পরীক্ষা দিই। এরপর রেজাল্ট বেরোল এপ্রিলে (১৯৬৬)। বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ অধ্যাপক ডঃ এন-কে সিনহা গবেষণা করার নির্দেশ দিলেন, বিষয় বেছে দিলেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা বৃত্তির নিয়োগ পত্র পেলাম। কিন্তু ডঃ ত্রিপাঠী সরকারি কলেজে শিক্ষকতা করার পরামর্শ দিলেন। মনে পড়ে রাইটার্স বিল্ডিংস-এ শিক্ষা দপ্তরে পাঠিয়ে ছিলেন—সহকারী শিক্ষা অধিকর্তা ছিলেন প্রেসিডেন্সি কলেজেরই ইতিহাসে ভূতপূর্ব অধ্যাপক ভূপেশ মুখোপাধ্যায়। নিয়োগপত্র সংগ্রহ করে সরকারি কলেজে কাজে যোগদান করি-আনুষ্ঠানিক ভাবে। পি. এস. সির মনোনয়ন পরে হয়। সরকারি কলেজের চাকুরী নিয়ে কলকাতার বাইরে কয়েকবছর কাটাতে হল, গবেষণা শিকেয় উঠল। সত্তরের দশকের শেষ দিকে তাঁর কাছে গবেষণা শুরু করি। ১৯৮০ থেকে ১৯৮৪ পর্যন্ত তাঁর তত্ত্বাবধানে U. G. C Teacher Fellowship নিয়ে গবেষণা কার্য সম্পন্ন করি। গবেষণার বিষয় ছিল "বাংলার নগরকেন্দ্রিক জাতীয়তাবাদী রাজনীতি, ১৯৩৭-৪৭ "। গবেষণার কার্যে তিনি অহেতুক হস্তক্ষেপ করেন নি, নিজের সিদ্ধান্তচাপিয়ে দেন নি। গবেষণার সুবাদেই তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর হয়। গবেষণা সন্দর্ভ পুস্তকাকারে প্রকাশিত হলে তিনি সযত্নে একটি মুখবন্ধ লিখে দিয়েছিলেন। এ আমার পরম সৌভাগ্য। আমি হলদিয়ার সরকারি কলেজে অধ্যক্ষ পদে যোগদানের পরের বছর ১৯৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারিতে স্যার সস্ত্রীক ও সপুত্র হলদিয়া গিয়েছিলেন। তাঁর থাকার ব্যবস্থা করেছিলাম। স্যার কলেজে এলেন। শরীর তাঁর ভেঙে পড়েছে—তথাপি তাঁর মানসিক ঋজুতা বিন্দুমাত্র শিথিল হয়নি। জমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত বিষয়ে সরকারি দপ্তরে কথাবার্তা বললেন, বুঝতে পারলাম তাঁর পাণ্ডিত্য ও মনস্বিতা সরকারী আধিকারিক মহলেও কত সুবিদিত।

এরপর ১৯৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বরে তাঁর শেষ গ্রন্থ 'স্বাধীনতার মুখ' বেরোল। জীবনের শেষ পর্যন্ত তাঁর জ্ঞান পিপাসা প্রবল ছিল। দেশ-সমাজ-বিশ্বরাজনীতি সব নিয়েই আলোচনা করতেন। 'পতন অভ্যুদয় বন্ধুর' বিংশ শতকের শেষ প্রান্তে এসেও মানবিক মূল্যবোধে তাঁর প্রগাঢ় আস্থা ছিল। বলতেন নৈতিক বিপ্লব এখন সবচেয়ে জরুরী। দেশজ ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রতি ছিল অনাবিল সহমর্মিতা। ঐতিহ্য বাদ দিয়ে আধুনিকতা অর্থহীন—উনিশ শতকের নবজাগৃতি নিয়ে লিখতে গিয়ে এই সূত্রই তিনি উপস্থাপিত করেছেন। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর চোখে 'সনাতন ধর্মের প্রচারক' আর 'নবীন ধর্মের প্রবক্তা'।

মার্চ মাসের মাঝামাঝি সময়ে স্যার নিউমোনিয়াতে আক্রান্ত হয়ে শয্যা নিলেন। ৯ই জুন তাঁকে শেষবারের মতো দেখতে গিয়েছিলাম। তারপর ১৮ই জুন চলে গেলেন অমৃত লোকে।

(২)

১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহ। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা শেষ করে অশীন দাশগুপ্ত প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপক পদে যোগ ছিলেন। প্রখ্যাত রসায়নবিদ প্রতুল চন্দ্র রক্ষিত তাঁর 'পেরিয়ে এলেম' (রবীন্দ্র পুরস্কার প্রাপ্ত) গ্রন্থে সরাসরি প্রফেসার পদে অশীন দাশগুপ্তের নিয়োগের বিষয়ে লিখেছেন। বোধ করি সেই সময় প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ সুখময় চক্রবর্তী ব্যতীত আর কেউ প্রথমে সরাসরি প্রফেসার পদে নিযুক্ত হন নি।

মনে পড়ে অধ্যাপকপদে যোগদানের পর আমাদের সঙ্গেই অশীন দাশগুপ্ত অধ্যাপক জীবনের প্রথম ক্লাসটি নিয়েছিলেন। আমি তখন ইতিহাস অনার্স (ত্রি-বার্ষিক ডিগ্রী কোর্সের প্রথম ব্যাচ)-এর প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র। তিনি আমদের পড়াতে শুরু করলেন আধুনিক ইউরোপের ইতিহাস (১৮৫০-১৯১৪ খ্রীঃ)। প্রথম ক্লাসেই আমরা হতবাক হয়ে গেলাম। ঘটনা সর্বস্ব ইতিহাসকে কী ভাবে কাঠামোতে গেঁথে তুলতে হয়—কী ভাবে বড় ইতিহাস আর ছোট ইতিহাসের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করতে হয়—একটি বিষয়কে কী ভাবে বিভিন্ন অংশে বিন্যস্ত করতে হয়—এসব আমাদের অজানা ছিল। বিশ্লেষণধর্মী পঠন-পাঠনের আস্বাদ পেলাম অশীন দাশগুপ্তের কাছে। ইডেন হিন্দু হোস্টেলে থাকতাম। সহপাঠী নয়ন চন্দ (এখন Far Eastern Economic Review পত্রিকার মুখ্য সম্পাদক) আর আমি স্যারের ক্লাস নোট নিয়ে হোস্টেলে আলাপ আলোচনা করতাম। বুঝতে পারলাম কুরুভিলা জ্যাকারিয়া আবার নতুন আঙ্গিকে ফিরে এসেছেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পড়াতে গিয়ে তিনি এর প্রেক্ষাপটকে দুটি অংশে ভাগ করে দিলেন—'Nationalism at home' ও 'imperialism abroad".

অশীন দাশগুপ্তের বিশ্লেষণধর্মী পঠন-পাঠনই যে শুধু আমাদের মন কেড়ে নিয়েছিল তা নয়, এর সঙ্গে তাঁর সহজ সরল সাবলীল সম্পর্ক আমাদের আকৃষ্ট করেছিল। গণ্য শিক্ষকেরা সচেতন ভাবে ছাত্র-শিক্ষকের মধ্যে যে ব্যবধান রাখতেন, অশীন বাবু আশ্চর্যভাবে সেই ব্যবধানের প্রাচীর ভেঙ্গে দিয়েছিলেন। আমরা তাঁকে আমাদের কাছের মানুষ বলে ভাবতে শুরু করলাম।

Courtesy: Presidency Alumni Association Calcutta, Kolkata 700073

অনার্সের তৃতীয় বর্ষে তিনি পড়াতেন আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। আগে এই বিষয়টি ইতিহাস অনার্সের পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। এত সহজভাবে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের জটিল গ্রন্থি উন্মোচন করতেন তা আমাদের বিমোহিত করতো। দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ের আন্তর্জাতিক রাজনীতিকে যুদ্ধ আর শান্তি এই দুই বিপরীত প্রক্রিয়ার প্রেক্ষাপটে বিশ্লেষণ করতেন।

অনার্সের পর স্নাতকোত্তর শ্রেণীতেও দুবছর অশীন দাশগুপ্তের কাছে পড়ার সৌভাগ্য হয়েছিল। এম.এ.-তে তিনি আন্তর্জাতিক সম্পর্ক পড়াতেন। মনে আছে ফ্লেমিং, Donald Zagoria প্রমুখের নতুন প্রকাশিত বইপত্র পড়তে দিতেন। স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে (১৯৬৩-৬৫) পড়ার সময় স্যারের সঙ্গে সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠতর হয়। একদিন স্যার জানালেন যে আমাকে প্রেসিডেন্সি কলেজের ম্যাগাজিনের সুবর্ণ জয়ন্তী সংখ্যার সম্পাদক নিয়োগ করা হয়েছে। স্যার সেই সময় ম্যাগাজিনের ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক ছিলেন। এরপর স্যারের সঙ্গে প্রতিনিয়ত যোগাযোগ রাখতে হয়েছিল। তাঁর নির্দেশে আমি খ্যাতনামা প্রাক্তন ছাত্রদের সঙ্গে দেখা করি এবং রচনা সংগৃহীত হয়। হীরেন্দ্রনাথ মুখার্জী, অজিতনাথ রায়, সুশোভন সরকার, এন. কে. সিনহা, বিষ্ণু দে, আবু সৈয়দ আইয়ুব, শঙ্খ ঘোষ, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, শিবতোষ মুখার্জী প্রমুখ লেখা দিয়েছিলেন। স্যারের নির্দেশমত কলেজ লাইব্রেরীতে ঘাঁটাঘাঁটি করে পুরাতন পত্রিকাগুলি থেকে জ্যাকারিয়া, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় প্রমুখের লেখা পুনর্মুদ্রনের জন্য বাছা হয়। রচনা সংগ্রহ, পত্রিকার প্রকাশনা এসব করতে এক বছরের বেশী সময় কেটে গেল। ১৯৬৪ সালের ম্যাগাজিন বেরোল ১৯৬৫ সালের সেপ্টেম্বরে। দুঃখের কথা, তার আগেই ১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দের অগাস্টে স্যার পাড়ি দিয়েছেন বিদেশে, অক্সফোর্ডে সেন্ট এন্টনিজ কলেজে ফেলোশিপ নিয়ে। বিদেশ থেকে ফিরে এসে স্যার প্রেসিডেন্সি কলেজে বিভাগীয় প্রধানের পদে অধিষ্ঠিত হলেন। তবে বেশী দিনের জন্য নয়। প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ইস্তফা দিয়ে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক পদে যোগ দিলেন।

আশির দশকে স্যার কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগারের পরিচালক পদে আসার পর, আবার যোগসূত্র গড়ে তুলি। মনে পড়ে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক পড়াবার সময় তিনি ই.এইচ. কার রচিত 'International Relations between the Two World Wars" গ্রন্থটি সযত্নে পড়ার নির্দেশ দিয়ে ছিলেন। আশির দশকে সাম্মানিক স্তরে বাংলায় পঠন-পাঠনের চল শুরু হলে কার-এর বইটির বাংলা ভাষান্তর করার কাজে হাত দিই। এই বিষয়ে স্যারের পরামর্শ নিয়েছিলাম। ধীরে ধীরে স্যার অসুস্থ হয়ে পড়ছিলেন। নব্বইয়ের দশকে স্যার দুরারোগ্য ব্যাধির কবলগ্রস্ত। আর এরপর গত ৪ঠা জুন জীবন মরণের সীমানা ছাড়িয়ে অসীমের পথে তাঁর যাত্রা। কিন্তু তাঁর সম্মোহনী প্রভাব আমাদের প্রজন্মের ছাত্রদের যেভাবে নাড়া দিয়েছিল তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।

প্রেসিডেন্সি কলেজে ডঃ অমলেশ ত্রিপাঠী ও ডঃ অশীন দাশগুপ্ত এ দুজন অসাধারণ মননশীল অধ্যাপকের কাছে ইতিহাস অধ্যয়ন করার জন্য গর্ব অনুভব করছি। ষাটের দশকের প্রথম দিকে কলেজে যে সব বড় মাপের অধ্যাপক ছিলেন, তা এখন কল্পনাও করা যায় না। সমাজের সর্বস্তরে অবমূল্যায়ন ঘটেছে, শিক্ষাদানে আগ্রহ কমেছে, উৎকর্ষ হ্রাস পেয়েছে। এখন বুঝি নিম্নমানের যুগ! যোগ্যতা ও দক্ষতা তেমন অগ্রাধিকার পায় না। ক্ষুব্ধ হয়ে ভাবি অমলেশ ত্রিপাঠী কী প্রেসিডেন্সি কলেজ, কী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়—কোথাও এমারিটাস অধ্যাপক হতে পারলেন না। অশীন দাশগুপ্ত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ অধ্যাপক পদে নিয়োগ পেলেন না। ঠিকমত স্থানে ঠিকমত যোগাযোগ রাখতে পারলে অনেক কিছু পাওয়া যায়। অমলেশ ত্রিপাঠী ও অশীন দাশগুপ্ত দুজনেই বোধ করি এরকম কলাকৌশল আয়ত্ত করতে পারেন নি। তবে ইতিহাস মহাকালের কথা—মহাকাশের বিচারে যোগ্যতা ও অবদান স্থায়ী হয়। ইতিহাস গবেষণায় ও মননশীলতায় ডঃ ত্রিপাঠী ও ডঃ দাশগুপ্ত দুজনেই অসাধারণ উৎকর্ষের পরিচয় দিয়েছেন।

এই পরিপ্রেক্ষিতে প্রেসিডেন্সি কলেজ ম্যাগাজিনের সুবর্ণ জয়ন্তী সংখ্যায় প্রকাশিত বিষ্ণু দে'র 'বহুমুখ' কবিতার শেষ কয়েকটি লাইন উদ্ধৃত করা বোধ করি অপ্রাসঙ্গিক হবে না—

"অথচ সে-দেশ নেই, এই কালান্তরে
কলকাতা অচেনা, অপহৃত, অপসৃত,
সে-পৃথিবী চলে গেছে, রয়েছে আধৃত
আমরা কয়েকজনা শুভ্র শূন্য চরে,
দুপাশে পরাধি ঢেউ, রৌদ্রাক্ত আদরে।" ■

Courtesy: Presidency Alumni Association Calcutta, Kolkata 700073